Visit Our Website :
natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৬ জুন, ২০১৮

৪১ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২৫ জুন, ২০১৮, সোমবার, ১০ আষাঢ়, ১৪২৫

গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ২২ জুন : গৃহবধূকে গায়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ, পূর্বস্থলী থানার খড়দত্ত পাড়া গ্রামে, অভিযুক্তরা পলাতক। গতকাল পূর্বস্থলী থানার পীলা পঞ্চায়েতের খড়দত্ত পাড়া গ্রামে এক গৃহবধূ বিকাল ৩টা নাগাদ শ্বশুরবাড়িতে মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে কাটোয়া মহকুমা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১২টা নাগাদ হাসপাতালে গৃহবধূর মৃত্যু হয়। দুই বছর আগে পূর্বস্থলী থানার খড়দত্ত পাড়া গ্রামে বাবুলাল সেখের ছেলে শ্যাম আখতার সেখের সাথে বিবাহ হয়। কাটোয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় কাটোয়া থানার পুলিশের কাছে জবানবন্দী দেন পুলিশ তা লিপিবদ্ধ করেন। উপযুক্ত পণ দেওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত টাকা আনার জন্য গৃহবধূর উপর চাপ দেওয়া হতো। গৃহবধূর বাবার আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়, ফলে অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়ছিল। এদিন বিকালে তাকে মারধর করা হয় তার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

কাটোয়া থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানান, গৃহবধূর নাম চুমকি বিবি (১৯)। তার মা ছোনাই বিবি লিখিত অভিযোগ করেন ৬ জনের নামে। ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়। অভিযুক্তদের সন্ধানে পূর্বস্থলী থানা ও কাটোয়া থানার পুলিশ খড়দত্ত পাড়া গ্রামে যান, অভিযুক্তরা সকলে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। অভিযুক্তদের সন্ধানে তদন্ত চলছে। এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ।

মন্তেশ্বরে কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা
ও নজরুল সু সন্ধ্যা
উদ্যোগে- রামকৃষ্ণ
পিপলন (ম
স্থান- গ্রন্থাগার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ জুন : মন্তেশ্বর রামকৃষ্ণ পাঠাগার ও সঙ্ঘ উদ্যোগে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। পিপলনে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ১৫ জন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর হাতে বই খাতা পেনের মতো পড়াশুনার সামগ্রী এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এগুলি তুলে দেন আয়োজক সংস্থার সম্পাদক তথা অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ধনঞ্জয় সামন্ত, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সত্যনারায়ণ কুণ্ডু, মন্তেশ্বর কলেজের অধ্যক্ষ তন্ময় পাল, শুভাশীষ পাত্র প্রমুখ। এদিন এই অনুষ্ঠান থেকে দুঃস্থ কৃতী ছাত্রদের সহায়তা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন সংস্থার কর্ণধার ধনঞ্জয় সামন্ত।

বঞ্চনার বিরুদ্ধে ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ, স্মারকলিপি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহকুমা শাসকের দপ্তর
All West Bengal Panchayat Engineer's Organization
Kalna Sub-Division Branch
(A Non Political Organization of Nirman Sahayak)

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ জুন : কালনা মহকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে কর্মরত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিরা (নির্মাণ সহায়ক) অবস্থান বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে সামিল হল। অল ওয়েস্টবেঙ্গল পঞ্চায়েত ইঞ্জিনিয়ার্স অর্গানাইজেশন-এর কালনা মহকুমা শাখার উদ্যোগে এদিন অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি কালনা মহকুমা শাসককে স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়। ইঞ্জিনিয়ারদের পেশাগত দাবিগুলি হল—নির্মাণ সহায়ক পদের নাম পরিবর্তন করে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার করতে হবে। অবিলম্বে পঞ্চায়েতের সকল স্থায়ী কর্মচারীকে হেলথ স্কিমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বেশি শ্রম দিবস সৃষ্টি ও স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির স্বার্থে পঞ্চায়েতের পাশাপাশি সরকারের অন্যান্য কারিগরি দপ্তরগুলিকেও যুক্ত করতে হবে। এ ছাড়াও সরকারি বঞ্চনা, কর্মক্ষেত্রে অফিসারদের অসদাচরণ, জব চার্টের বাইরে অতিরিক্ত কাজ করাতে বাধ্য করানোর প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভে সরব হন তারা। শেষে উল্লেখিত দাবি সম্বলিত স্মারকপত্র জমা দেওয়া হয় কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়াকে।

ক্লাবের অর্থ তছরূপ : মার খেলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও তার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ জুন : সরকারি অর্থ প্রাপ্ত ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে তহবিল নয়ছয়ের অভিযোগ তুলে গত কাল রাতে বেদম মার খেলেন জনৈকা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষা ও তার স্বামী। কর্মাধ্যক্ষর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তিনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালগরিয়া গ্রামে। পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কর্মাধ্যক্ষ রীতা দাসের বাড়ি এই গ্রামে। কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় আজ এই প্রতিবেদককে রীতা দাস জানান, তার স্বামী মালগরিয়া রক্ষাকালী ক্লাবের সম্পাদক। এই ক্লাব খেলাধূলা উন্নয়নের জন্য সরকার থেকে দুই লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে। তার মধ্যে এক লক্ষ টাকা নিয়ে ক্লাবের কিছু সদস্য সুদে খাটাচ্ছেন। বাকি এক লক্ষ টাকা রয়েছে স্থানীয় নপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। এই এক লক্ষ টাকা তুলতেও ক্লাবের সদস্যদের একাংশ আমার স্বামীর উপর চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু আমার স্বামীর দাবি ছিল সরকারি অনুদানের অর্থ কোনোভাবেই সুদের কারবারে খাটানো যাবে না, গ্রামের উন্নয়নের কাজ করতে হবে। কিন্তু তা ওরা মানতে নারাজ। শেষে গত কাল রাতে আমার স্বামীকে

—এরপর চারের পাতায়

মোড়ক খুলতেই কান্না নবজাতকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ২০ জুন : জন্মাবার পরই মরে গেছে ভেবে নিয়ে দুটি নবজাতককেই পলিথিনে মুড়ে রাখা হয়েছিল কয়েক ঘন্টা। পলিথিনের মোড়ক খুলে পেসেন্ট পার্টিকে দেখাতে গিয়েই কেঁদে উঠল এক নবজাতক। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা শহর সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমে। পরে ওই নার্সিংহোম থেকে নবজাতকটিকে কালনা মহকুমা হাসপাতালের এস.এন.সি.ইউ-তে ভর্তি করা হয়। সেখানে বেশ কিছু সময় বেঁচে থাকার পর নবজাতকটির মৃত্যু হয়। কালনা থানার বাঘনাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রামের মিলি খাতুন নামের এক প্রসূতিকে সন্ধ্যায় ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানকার স্ত্রী বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবু বলেন—এখন প্রসবের সময় হয়নি। নার্সিংহোমে থেকে চিকিৎসা করলে ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবুর এই আশ্বাসের পর পেসেন্ট পার্টিরা রাত্রে বাড়ি চলে যান। পরদিন সকালে নার্সিংহোম থেকে জানানো হয় ভোর চারটে নাগাদ মিলি খাতুন দুটি অপুষ্ট মৃত শিশু প্রসব করেছে। এই খবর পেয়ে দূরের গ্রাম থেকে মিলির আত্মীয় স্বজনরা নার্সিংহোমে ছুটে আসেন। তারা শিশু দুটি দেখানোর জন্য নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে বলেন। দুটি পলিথনের মোড়ক এনে খুলতেই একটি নবজাতক কেঁদে ওঠে। আত্মীয়স্বজনরা সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবুর সামনে চেঁচামেচি করে কেঁদে ওঠা নবজাতককে কালনা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার এস.এন.সি.ইউ-তে চিকিৎসারত অবস্থায় বেলা ১১টায় নবজাতকটির মৃত্যু হয়। মিলি খাতুনের নিকট আত্মীয় সিপিআই(এম)-এর সর্বক্ষণের কর্মী আকবর শেখ। তিনি জানান, জীবন্ত শিশুকে মৃত ধরে নিয়ে পলিথিনে মোড়ক করে রেখে কি অমানবিক কাজ করল নার্সিংহোম তা কল্পনা করা যাচ্ছে না।

মিথ্যা এজাহার না দেওয়ায় স্ত্রীর উপর নির্যাতন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ জুন : প্রতিবাদী যুবকের বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যা এজাহার না দেওয়ায় নিজের স্ত্রীর উপর শারীরিক নির্যাতন চালায় এক যুবক। শুধু তাই নয় নির্যাতনের পর ওই গৃহবধূকে বাড়ি থেকেও বের করে দেওয়া হয়। সে এখন ছোট্ট শিশুপুত্রকে নিয়ে নিজের বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা-১ নং ব্লকের কাঁকুরিয়া গ্রামে। এখানে রিঙ্কু মালিক ও নেদো ধারা পরিবারের পাশাপাশি বসবাস। রিঙ্কু মালিক পরিবারের অভিযোগ নেদো ধারা নিজের বাড়ির ভাটিতে মদ তৈরি করে। এই সূত্রে নানা ধরনের মানুষ এসে পাড়ায় উৎপাত করে। আমরা সবাই মিলে তার প্রতিবাদ করি। লোকজন নিয়ে মারতে এলে মানুষজনের প্রতিরোধে নেদো ধারা পালাতে বাধ্য হয়। বিশ্বজিৎ মালিক নামের এক প্রতিবাদী যুবকের বিরুদ্ধে নেদো ধারা নিজের স্ত্রী সন্তানকে দিয়ে থানায় মিথ্যা এজাহার দেওয়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সান্ত্বনা ধারা নিজের স্বামীর মুখের উপর বলে দেয় আমি মিথ্যা এজাহার দিতে পারবো না। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে নেদো নিজের স্ত্রীর উপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বাপের বাড়ি চলে গেছে বলেও সূত্রের খবর। এই ঘটনায় নেদো ধারা আরো ক্ষুব্ধ হয়ে আজ রাত্রে রিঙ্কু মালিকের বাড়িতে সশস্ত্র হামলা চালায়।

রিঙ্কু মালিকের বক্তব্য বাড়িতে আমার ছেলেরা না থাকায় নেদো ধারা আমার গলা লক্ষ্য করে কাস্তের কোপ বসায়। আমি হাতে করে আটকাতে গেলে হাতে কোপ লাগে। সেখান থেকে ছিটকে নাকে লাগলে নাক অনেকটাই কেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই কালনা হাসপাতালে রিঙ্কু মালিককে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

পুলিশ জানায়, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

নতুন চিঠি
২৫ জুন, ২০১৮

কাশ্মীরে বিভাজনের বিষ

গত ১৪ই জুন কাশ্মীরের বিশিষ্ট সাংবাদিক সুজাত বুখারি শ্রীনগর প্রেস এনক্লেভে খুন হন। তাঁর হত্যাকাণ্ডে সন্ত্রাসবাদীদের হাত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তারপর কাশ্মীরে জোট সরকারের বিদায়ের পর রাষ্ট্রপতি শাসনের নামে এখন কেন্দ্রের শাসন চেপেছে। গত ১৯শে জুন বি জে পি সভাপতি অমিত শাহ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করার পরই বি জে পি নেতা রাম মাধব ঘোষণা করেন, কাশ্মীরের পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে পড়ায় সরকার থেকে সমর্থন তুলে নেওয়া ছাড়া তাঁদের কাছে অন্য কোন পথ খোলা নেই। অর্থাৎ জোট সরকার কাশ্মীরে ক্ষমতাসীন হবার পর দিনে দিনে অশান্তি, রক্তপাত, হত্যা, হিংসা বৃদ্ধি পেয়েছে—এ তথ্য তাঁরা এতদিন আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছেন, যা দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দুই দলের জোট সরকারের গঠনের সময় থেকেই বোঝা গিয়েছিল।

বর্তমানে কেন্দ্রের সরকারের প্রতিনিধি হয়ে শাসন করছেন রাজ্যপাল এ এন ওয়ারা। রাজ্যপালের শাসন যে তাদের হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা তুলে দিয়েছে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস না দেখালেও এমনই ভাব প্রকাশ করেছেন কাশ্মীরের বর্তমান পুলিশ প্রধান এস পি বৈদ্য। খোলাখুলি তিনি বলেছেন, এবার থেকে তাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। বোঝা যাচ্ছে নিরাপত্তাবাহিনী কাশ্মীরে এবার বেপরোয়া রক্ত ঝরানোর হোলি খেলবে।

কেন্দ্রে মোদী সরকার আসীন আর রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতাসীন, সেখানেও বি জে পি—তবু কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। বোঝা যায় তাদের লক্ষ্যই ছিল কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান নয় আসলে ক্ষমতা দখল। যেমন ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রাক্তন মন্ত্রী চৌধুরী লাল সিং-এর আচরণ। ক'দিন আগে ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের মন্ত্রী। কাঠুয়া গণধর্ষণে অভিযুক্তের সমর্থনে মিছিলও করেছেন বি জে পি দলের এই মান্যবর। মন্ত্রী থাকাকালীন জড়িয়েছেন একাধিক বিতর্কে। বি জে পি-র এই নেতা মনে করেন কাশ্মীরে যত অঘটনের নেপথ্যে রয়েছেন সাংবাদিকরা। তার মতে সাংবাদিকরা যেনতেন প্রকারে বি জে পি-র সমালোচনা করে, কোনও ঘটনায় বি জে পি-কে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কালিমালেপন করতে ব্যস্ত হয়। কাঠুয়া গণধর্ষণকাণ্ডে ভুল ছবি তুলে ধরে সাংবাদিকরাই বি জে পি-র বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছেন যার ফলে দেশজুড়ে মানুষের মধ্যে বি জে পি দলটি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা তৈরি হয়। সম্প্রতি তিনি কাশ্মীরের সাংবাদিকদের শাসালেন এই বলে যে, সাংবাদিকরা নিজেরা লক্ষ্মণরেখা ঠিক করে নিন কী করবেন! তাঁরা কি সুস্থভাবে বাঁচতে চান নাকি সুজাত বুখারির মতো পরিণতি দেখতে চান?

সরাসরি এই হুমকি জনমানসে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে। বোঝা যায় বি জে পি দলটি আসলে সুবিধাবাদী জোটে এক হয়ে কাশ্মীরের সরকারি ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারার সুবিধা নেওয়া আর মানুষের মধ্যে বিভাজনের বীজ বপন করার কাজে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। ইতিপূর্বে এই রাজ্যপালের অধীনে চার চারবার কেন্দ্রের শাসন জারি হয়েছিল, তাতে কাশ্মীরের সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। নতুন করে সেই একই রাজ্যপালের শাসন জারিতে সেই বিভাজন বিষ নির্মূল হবে কী?

এক ডজন প্রশ্ন

১. সূর্য স্থির পৃথিবী ঘুরছে বলার অপরাধে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর কোথায় কবে বিচার শুরু হয়?
২. কবিশেখর কালিদাস রায় কোথায় কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
৩. তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কবে কোথায় শুরু হয়? ভারতের কে কে তাতে যোগদান করেন?
৪. 'আজকাল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন? তিনি কবে জন্মান?
৫. কে কবে জাতীয় কংগ্রেস থেকে বের হয়ে এসে ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন? কবে?
৬. পলাশির যুদ্ধ শেষ হয়, সিরাজ-উল দৌল্লা পরাজিত হন কবে? তাঁর কে সেনাপতি ছিলেন যিনি এই যুদ্ধে নিহত হন?
৭. ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির পুত্র সঞ্জয় গান্ধি কবে কিভাবে নিহত হন?
৮. পোলিও টিকা আবিষ্কারক কে ছিলেন? তিনি কবে প্রয়াত হন?
৯. কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তিনি কবে জন্মান?
১০. ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রী কবে দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করেন? কবে করেন?
১১. কার মৃত্যুদিনকে স্মরণে রেখে বিশ্ব শ্বেতী দিবস কবে পালিত হয়? কবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল?
১২. পশ্চিমবঙ্গে ২০তম জেলা হিসাবে কোন জেলা সরকারি স্বীকৃতি পায়? কবে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহকচাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

সাঁওতাল বিদ্রোহ—'হুল'

অনিল মাইতি

আগুন জ্বলেছিল পাহাড়ের কোলে। সে পাহাড় দলদলি পাহাড়। একটি স্ফুলিঙ্গই সেদিন দাবানল সৃষ্টি করেছিল সমগ্র সাঁওতাল পরগণায়। জোতদার-মহাজনের শোষণের ভিত কেঁপেছিল সেদিন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শাসন, শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সূচিত হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

সাঁওতালি ভাষায় 'হুল'। যার বাংলা অর্থ সংগ্রাম, মহাসংগ্রাম বা অভ্যুত্থান। 'হুল'-এর অন্যতম গবেষক অরুণ চৌধুরী 'অভ্যুত্থান' শব্দটিকেই মান্যতা দিয়েছেন।

রাজমহল পাহাড়তলি এলাকাকে বলা হতো দামিনে কোহ বা দামিন ই কোহ। ওই এলাকার প্রচুর উর্বর জমি জঙ্গলে ঢাকা ছিল। জমি পাবার আশায় ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই সাঁওতালরা ওই এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। ২৫ বছরে প্রায় ৫ লক্ষ বিঘা জমি তারা হাসিল (উদ্ধার) করে। তারা ভাবতো ওই জমি তাদের নিজের। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাদের সেই মোহ ভাঙতে থাকে। ওই জমিতে থাবা পড়তে থাকে জোতদার, মহাজন ও ইংরেজ শাসকের।

ওই জমি খুবই উর্বর হওয়ায় ফসল ফলতো প্রচুর পরিমাণে। বিশেষ করে ধান। ফসল লুটের জন্য মহাজনরা কৃষকদের দাদন দিতে শুরু করে। সুদের হার ছিল ৫০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত। ফলে বংশপরম্পরায় ওই ঋণ শোধ হতো না। বরং বেড়েই যেত চক্রবৃদ্ধি হারে। যার জন্য গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি এমকি লাঙ্গল পর্যন্ত চলে যেত মহাজনের ঘরে। সম্ভ্রম খোয়াতে হতো মেয়েদের।

ধান ওঠার সময় মহাজনরা গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প করতো। সঙ্গে থাকতো পাইক বরকন্দাজ। তাদের থাকা-খাওয়া এমনকি আনন্দ ফুর্তির সব খরচ বহন করতে হতো গরিব কৃষকদের। ওজনের জন্য মহাজনদের কাছে বাটখারার নামে থাকতো সিঁদুর মাখানো দু'ধরনের পাথরের চাঁই। নাম ছিল— 'কেনারাম-বেচারাম' অথবা 'ছোটবউ-বড়বউ'। ওজনের কারসাজিতে সমস্ত ধান চলে যেত মহাজনের ঘরে। সর্বশান্ত হয়ে যেত কৃষকরা।

এই সময় ওই এলাকায় রেল লাইন পাতার কাজ চলছিল। ইংরেজ শাসকরা জোর করে মানুষজনকে রেল লাইন পাতার কাজে নিয়ে যেত। দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করানোর পরও তাদের কোনো মজুরি দেওয়া হতো না। ফলে বহু মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হতো। ওই বল্গাহীন শোষণ আর অত্যাচারের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ জমে বারুদের স্তূপে পরিণত হয়। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন। সাঁওতাল-পরগণার দলদলি পাহাড়ের কোলে বিরাট মাঠে জমায়েত হয় ৪০০টি গ্রামের হাজার হাজার সাঁওতাল কৃষক। জমায়েত জনসমুদ্রের আকার ধারণ করে। এই সমাবেশ থেকেই তারা সিধু ও কানুকে নেতা নির্বাচন করে। তাদের আরও দুই ভাই চাঁদ ও ভৈরব হয় প্রধান সহকারি। চার ভাইই ছিলেন সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। এই সমাবেশ থেকেই তাঁরা 'হুল'-এর ডাক দেন।

স্থানীয় প্রশাসনের কাছে বারবার দরবার করেও কোনো ফল না হওয়ায় সমাবেশ থেকেই আওয়াজ ওঠে—'চলো কলকাতা—বড়লাটের কাছে।' শুরু হয় কলকাতা অভিমুখে যাত্রা। এদের সাথে যোগ দেয় কামার, কুমোর, তেলি, ডোম, কুর্মী, বাগ্দি ও মোমিন সম্প্রদায়ের দরিদ্র মুসলমানগণ। সকলেই ছিল বঞ্চনার শিকার। এই বিশাল বাহিনীর অভিযানে ও রণহুঙ্কারে কেঁপে ওঠে সারা সাঁওতাল পরগণা। এই অভিযান ঠেকাতে এসে কুখ্যাত মহেশ দারোগাকে প্রাণ দিতে হয়। দিনটা ছিল ৭ জুলাই ১৮৫৫। প্রাণ দিতে হয় আরও কয়েকজন পুলিশ ও জোতদার-মহাজনকে। এরপর বিরাট বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহ দমনে আসে মেজর ব্যারোজ। পাঁচ ঘন্টা চলে উভয় পক্ষের তুমুল লড়াই। অবশেষে রণাঙ্গণ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় মেজর ব্যারোজ। সংগ্রামী কৃষকদের জয়ধ্বনীতে কেঁপে ওঠে রণাঙ্গন।

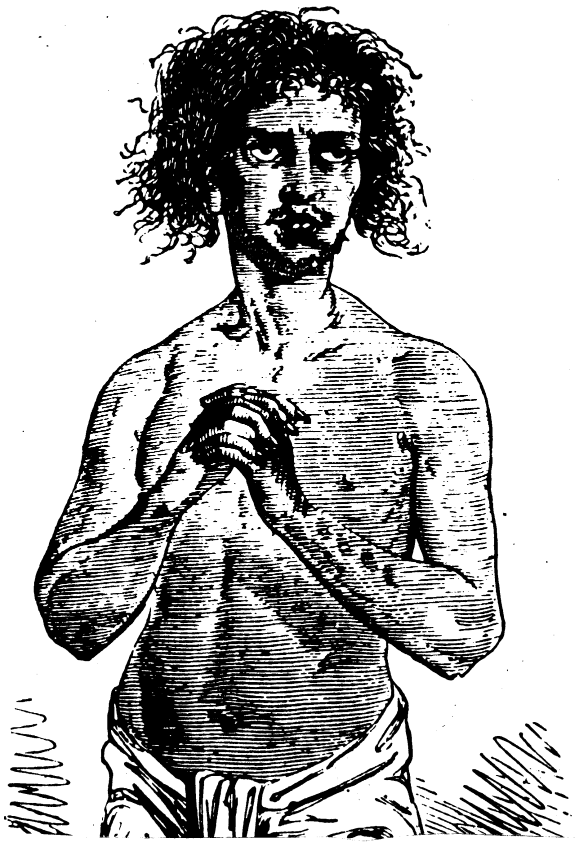

১২ জুলাই '৫৫ বিদ্রোহীরা দখল করে পাকুড়ের রাজবাড়ি। ওই রাজবাড়ি ছিল বিদ্রোহ দমনের আঁতুরঘর। কয়েকজন মহিলা ছাড়া সকলেই রাজবাড়ি ছেড়ে পালায়। কানুর নির্দেশে রাজবাড়ির মহিলাদের সসম্মানে সরিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র খাবার সংগ্রহ করা হয় রাজবাড়ি থেকে। এইবার সর্বশক্তি নিয়ে বিদ্রোহ দমনে নামে ইংরেজ শাসক। জারি করে সামরিক আইন। দমন-পীড়ন চরম আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা উপলব্ধি করেন, আর আবেদন-নিবেদনে কাজ হবে না। তাই তাঁরা আওয়াজ তোলেন, 'অবসান চাই ইংরেজ শাসনের।' তাঁরা প্রথম অত্যন্ত সচেতনভাবেই এই রাজনৈতিক আওয়াজ তোলেন।

এবার লড়াই আর একজায়গায় সীমাবদ্ধ থাকল না। ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দলে। সর্বত্রই গড়ে ওঠে নতুন নেতৃত্ব। তবে মূল নির্দেশ আসতো সিধু-কানুর কাছ থেকে। নেতৃত্বের নির্দেশ ছিল যতক্ষণ ধামসার আওয়াজ শোনা যাবে, ততক্ষণ একজনও বিদ্রোহী লড়াই ছেড়ে যাবে না। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে।

বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান জেলার আসানসোল, রানিগঞ্জ এবং বাঁকুড়া জেলাতেও। কামার সম্প্রদায়ের মানুষেরা দিনরাত হাপর চালিয়ে তৈরি করেন হাজার হাজার তীরের ফলা (কাঁড়)। মোমিন সম্প্রদায়ের মানুষরা খবর সংগ্রহ করে আনতেন। ইংরেজ শাসকরা উভয় সম্প্রদায়ের পল্লিগুলো ধ্বংস করে, হত্যা করে তাদের।

'হুল'-এর মহানায়ক কানুর স্ত্রী ফুলকি বা ফুলমনি গড়ে তোলেন নারী বাহিনী। তাঁরা গ্রাম পাহারা দিতেন। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিদ্রোহীদের কাছে জল, খাবার ও তীর সরবরাহ করতেন। এই খবর জানার পর ইংরেজ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশবিক অত্যাচার চালায় তাদের উপর। শত্রুর কাছে তাঁরা আত্মসমর্পণ না করে মরণপণ লড়াই করে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।

সামরিক আইন সম্পর্কে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন—"সৈন্যবাহিনীর কর্তারাতো এমনিতেই সাঁওতাল দেখামাত্র গুলি করে মারছে, সাঁওতাল গ্রামও জ্বালিয়ে দিচ্ছে...।" এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন।

তিনি আরও লেখেন, "...পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার সাঁওতাল এই বিদ্রোহে প্রাণ দিয়েছিল...।" বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন ৫০ হাজার। এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের শৃঙ্খলাবোধ ছিল অসাধারণ। একবার সরকারি সৈন্যদের হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ৫৫ জন বিদ্রোহী একটি মাটির ঘরে আশ্রয় নেয়। সৈন্যরা তাদের ঘেরাও করে আত্মসমর্পণ করতে বললে বৃদ্ধ তার টাঙ্গি দিয়ে সিপাইকে হত্যা করে।

ইতিহাসকে বারে বারে কলঙ্কিত করেছে কিছু বেইমান, ধান্দাবাদ ও বিশ্বাসঘাতক। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই বিদ্রোহীদের মাঝে হঠাৎ উদয় হয় এক সাধু। সে বলে, সে মন্ত্র পড়ে ধুলো পড়ে দিলে আর সৈন্যদের বন্দুক থেকে গুলি বেরেবে না, বেরেবো জল। বিদ্রোহীরা তার কথা বিশ্বাস করে ধুলো মেখে অগ্রসর হতে থাকে। পরিকল্পনা মতো সেন্যরা ফাঁকা আওয়াজ করে। বিদ্রোহীরা ভাবেন সাধুর কথাই ঠিক। তাই তারা নতুন উদ্যমে অগ্রসর হতেই সৈন্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। শত শত বিদ্রোহী শহিদ হন। খবর পেয়ে কানুর নির্দেশে ওই 'সাধু'কে ধরে এন তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

বিদ্রোহ যখন তুঙ্গে তখন ইংরেজ শাসকরা হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে সিধু ও কানুকে। নানান ধরনের উৎকোচ দিয়ে দালাল খুঁজতে থাকে মিলেও যায়। ১৮৫৫ সালের নভেম্বর মাসে মেঝিয়া বা মুনিয়া নামে এক বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়েন সিধু। তাঁকে ভগনাডিহি গ্রামে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। মতান্তরে তাঁর বাড়ির সামনে গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়া হয়। খবর শোনামাত্র মুনিয়াকে ধরে এনে কানু তার মৃত্যুদণ্ড দেন। রণাঙ্গনে মৃত্যু হয় চাঁদ ভৈরবের।

আবার বিশ্বাসঘাতকতা। জারোয়ার সিং নামে এক বিশ্বাসঘাতকের তৎপরতায় ৩০ নভেম্বর ১৮৫৫ ধরা

—এরপর চারের পাতায়

অন্য সংস্কৃতি

শান্তির পারাবত

তন্ময় কাঞ্জিলাল

পেপারমিলটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মানুষটা কেমন হয়ে গেছে। কলেজে পাশ করেই নিশীথ চক্রবর্তী গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে এই পেপারমিলটাতে চাকরি পেয়েছিল। সাইকেলে চেপে ডিউটি যেত। পেপারমিলে বন্ধুদের নিয়ে নাটক, মেসে আড্ডা, রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যচর্চা, বই পড়া ইত্যাদি নিয়ে দারুণ সময়টা কেটেছে। মিলের ল্যাবরেটরিতে সব সহকর্মীই ছিল অত্যন্ত রসিক ও মননশীল। চাকরি ছাড়াও একটা অন্য আনন্দ ছিল। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের আড্ডায় বন্ধুদের সাথে স্মৃতিগুলো নাড়াচাড়া করে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্লাবের বাইরে অশত্থগাছটার নীচে চাতালে এসে নিশীথ বসে। ছেলেবেলার বন্ধু-বান্ধবও একে একে এসে হাজির হয়। পুরনোদিনের গল্প, হাসি-মজা, তর্ক-বিতর্ক হয়। এই আড্ডা খুব উপভোগ করে, আনন্দ পায়। সবাই কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছে। বাজার-দোকান, স্ত্রীকে টুকিটাকি সাহায্য, নাতিকে স্কুলবাসে চাপানো বা ব্যাঙ্ক-পোস্টঅফিসের কাজ সেরে দুপুরের খাবার খেয়ে খবরের কাগজটা পড়া নিশীথের প্রতিদিনের অভ্যেস। কাগজ পড়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বন্ধুদের কাছে এসে সেই উত্তেজনা প্রকাশ করে। নান্তু ওকে রাগিয়ে দেয়। বলে, তুই তো আছিস আমাদের নেতা। গাছতলায় বিপ্লব না করে মাঠে-ময়দানে আবার লড়াই শুরু কর। কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দে। নিশীথ রেগে বলে ওঠে—এই তো মুস্কিল তোকে নিয়ে যত্তসব মধ্যবিত্ত পাতি বুর্জোয়া সুলভ কথাবার্তা বলে জীবনটাকে পার করলি। সেই বয়সটা থাকলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তাম। তপন পাশ থেকে বলে—ঠিকই বলেছিস। এখন সবই তো সাজানো ঘটনা, ছোট ঘটনা, দুষ্টুছেলের কাজ। নিশীথ বলে—রিয়েলি মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিচ্ছু ভালো লাগছে না। পাশে মানিক বসে ওর শরীরে মেদ জমেছে। মাথায় মস্ত টাকের চারপাশে অবিন্যস্ত সাদা চুল। বিড়ির নেশাটা এখনো আছে। বিজ্ঞের মতো নিশীথকে উপদেশ দেয়—আর কটা দিন বাঁচব? এখানে কিছুক্ষণের জন্য শান্তি পেতে আসি। এটুকু সময়ে দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে কী লাভ নিশীথ?

নিশীথ বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র ছিল। লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভালো ছিল। আর রসায়নটা এখনা ভুলতে পারেনি। জীবিকা অর্জনেও বিষয়গুলো কাজে লেগে গেছে। পেপারমিলে কেমিস্টের চাকরিটা পেয়েছিল নিজের মেধা দিয়ে। ওর কাজের নিষ্ঠা আর দক্ষতা দেখে ওপরওয়ালারাও ওকে সম্মান দিত। গল্প-কবিতা-নাটক লেখার অভ্যেস ছিল। ভালো অভিনয় করত। বনবাদাড়ে ঘুরে গাছপালার শিকড় আর ডাল এনে বাড়িতে কাটুম-কুটুম বানাত। অনেক গুণের অধিকারী ছিল। নান্তুর মতো বাউন্ডুলে ছেলের সাথে মিশেও ও কিন্তু সত্যিকারের গুডবয় ছিল। বরাবরই ওর মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব ছিল তাই বন্ধুরাও ওর কথা শুনত। বন্ধুদের বনভোজনেই হোক আর নাটকই হোক—নেতা নিশীথ। ওর পাল্লায় পড়ে বন্ধুরাও কেউ কেউ খাতা-কলম নিয়ে দু-চারটে কবিতা-গল্প লিখে ফেলত।

প্রতিভা কখনো চাপা থাকে না। পশ্চিমবঙ্গে তখন অস্থির অবস্থা। চারিদিকে রাজনীতির জোয়ার এসেছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়ে চলে, কর্মী তৈরি হয়। একজন শ্রমিক নেতার নজরে নিশীথের কার্যকলাপ ধরা পড়ে। সেই নেতাও তখন এলাকার কয়লাখনির শ্রমিক আন্দোলনের উদীয়মান লড়াকু নেতা। তার সঙ্গে নাটক-সংস্কৃতি জগতেও তার অবাধ বিচরণ। এই বামপন্থী নেতাজি নিজে নাটক লিখতেন আবার সুঅভিনেতাও ছিলেন। যুবকদের আকৃষ্ট করার প্রতিটি গুণই তার মধ্যে ছিল। ফলে নিশীথের মতো সুস্থ সংস্কৃতির যুবক সেই নেতার সান্নিধ্যে এসে সেই সময় একজন বলিষ্ঠ কর্মী হতে পেরেছিল। বাহাত্তরের কলঙ্কময় দিনে গোপনে পার্টির কাজ করেছে। সাঁওতাল-বাউরি-মুচি-ডোম প্রভৃতি নীচুতলার বস্তিগুলোতে নিশীথের ছিল দিবারাত্রি যাতায়াত। জরুরি অবস্থার সময় নিশীথ তার সমস্ত মার্কসবাদী বইপত্র লুকিয়ে রাখতে দিয়েছিল সেই সময়ের সাধারণ যুবক নান্তুকে। কারণ ও জানত তার এই অন্তরঙ্গ বন্ধুটি পার্টিসদস্য না হলেও একজন অন্ধ সমর্থক। তাই গোপনীয়তা থাকবে। নান্তু একমাত্র নিশীথকে সামনে দেখে নিশীথের দলটাকে ভালোবেসেছিল। নিশীথ বিশ্বাস করত পার্টিসদস্যের চেয়েও নান্তুর মতো সাধারণ সমর্থকের সংখ্যাটা বেশি যাদের জন্য পার্টি এগিয়ে চলেছে।

২.

দুরন্ত যৌবনের স্পন্দন কেমন যেন শিথিল হয়ে গেল পেপারমিল বন্ধ হওয়ায়। পেট চালাবার জন্য শুরু হল ছোটাছুটি। ঘরবাড়ি ছেড়ে দূর রাজ্যে পাড়ি দেওয়াও মুস্কিল। বাড়িতে স্ত্রী একা কীভাবে সামলাবে ছেলে-মেয়েকে। জীবনধারণের জন্য টিউশনি শুরু করল। মেয়েটা বড় হচ্ছে—বিয়ে দিতে হবে। ছেলেকে পড়াতে হবে—ও স্কুলে পড়ছে। পেপারমিলের বহু ছাঁটাই কর্মী তখন কেউ অভাবে আত্মঘাতী, কেউ নিরুদ্দেশ, কেউ রাস্তার ধারে সব্জি বিক্রি করছে, কেউ আবার লটারির টিকিট বিক্রি করে। দিশেহারা নিশীথ কাছাকাছি একটা নতুন গড়ে ওঠা কারখানায় ছোট একটা চাকরি পেয়ে চলে গেল। জীবিকা নির্বাহটাই তখন প্রধান, কর্মজীবনে সরাসরি রাজনীতি করাটা বিপন্ন হয়ে দাঁড়াল।

কয়েক বছর পর সেই কারখানাটাও বন্ধ হয়ে গেল। নিশীথ আবার গ্রামে ফিরল। শুরু হল নতুন জীবনযুদ্ধ। খুঁজে খুঁজে কিছু ছেলেমেয়ে পেয়ে গেল। নিশীথের পারিশ্রমিক অনেক কম। নিশীথ বিজ্ঞানের সব বিষয়ও পড়াতে পারে আবার ইংরাজিও ভালো পড়াতে পারে। পারিশ্রমিক হোক কম তবু সম্মানের, কারো বাড়িতে এক কাপ চায়ের সঙ্গে দুটো বিস্কুটও তো দেয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে সাইকেলে গ্রামের সব পাড়াতে, এমনকি গ্রামের বাইরেও দু-একটা অবাঙালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে নিশীথ ছুটে বেড়ায়। তবে উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কাছে নিশীথ খুব প্রিয়। ভালো পড়াতে পারে জনশ্রুতি আছে।

নিশীথের বিশ্বাসগুলো ভেঙে পড়েনি। কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান-পতন দেখে ও মাঝে মাঝে হতাশও হয়। কিন্তু ও জানে মার্কসবাদের মৃত্যু নেই। ইতিমধ্যে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে—জামাই ইঞ্জিনিয়ার। ছেলেটাও কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা ইলেকট্রনিক্স দোকানে কাজ করে। এভাবে নিশীথের জীবন চলে। পুরনো সাইকেলটা ঠেলতে পারে না। পুত্রবধূর পরামর্শে বাড়িতেই তিনবেলা পড়ায়। পুরনো দিনের সঙ্গীরা দেখতে পেলে এখনো বলে, আপনার লেখা নাটক এলাকা ছাড়িয়েও বহু জায়গায় আলোড়ন তুলেছিল। আবার লিখুন। আমরা করাব। আপনার কাছেই তো আমরা শিখেছি জীবনকে কীভাবে ভালোবাসতে হয়। এসব শুনে নিশীথের হাড় বের করা বুকটা ফুলে ওঠে।

হঠাৎ ঝড়ের মতো একটা পরিবর্তন এল। সারা দেশে নতুন দল, নতুন অশান্ত এক সরকার। এবার নাকি উন্নয়নের জোয়ার বইবে। বন্ধ কলকারখানা সব খুলে যাবে, নতুন কারখানা হবে—পশ্চিমবঙ্গে বেকার আর থাকবে না। নিশীথ সব দেখে এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না। নিশীথের ছেলে ক্ষোভে বাবাকে ধিক্কার দেয়—“দেখলো তো? তোমাকে অনেকবার বলেছি তোমার পার্টি চলবে না, ঘুণ ধরেছে। তুমিই বোকা, কিছু করলে না। তাই আমাকে দোকানের মাল বেচার কাজ করতে হচ্ছে। দেখেছো তো তোমার পার্টির বাটাদার চেহারা? হাতে চকচকে মাদুলি, আঙুলগুলোতে নানা পাথরের আংটি, রোজ কালীমন্দিরে মাথা ঠুকে কত সুখে আছে। বাটাদার মেয়ের বিয়েতে কত হাজার লোক খেয়েছে জানো? জানো ওর কটা বাস? তোমার মতো ভাঙা সাইকেল ঠেলে টিউশনি করে না।”

ছেলের কথা শুনে নিশীথ আঘাত পায় না। বলে, ওরে এরা কমিউনিস্ট নয়, ঝড়ে এসেছে, ঝড়ে উড়ে যাবে। এরা পার্টিতে থাকবে না। তা নাহলে সারা দেশে খেটে খাওয়া মানুষ লড়াই করছে কীভাবে? ঘটকদের তরুণকে দেখিস তো? তৃণমূলের মার খেয়েও সন্ত্রাসের ভয়ে পালিয়ে যায়নি। লড়াই করে বেঁচে আছে। ভাঙাবাড়ি আর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছিস তো? সাইকেল চেপে অফিস যায়। নেতা বলে হাজিরাখাতায় সই করে মিটিং আছে বলে পালায় না। এসব শুনে ছেলে বলে—“তোমার ওই একই বক্তৃতার ক্যাসেট শুনতে ভালো লাগে না”। নিশীথের দীর্ঘদিনের সাথী বিশ্বাসী বন্ধু মানিক বোঝায়—“তুই এখন ফসিল। চুপচাপ থাক। গ্রামে অনেক ছেলে শাসক দলে ঢুকেছে। তোর হঠকারী কথাবার্তা কানে গেলে উট্‌কো বিপদে পড়বি। বয়স হয়েছে—ধ্যান কর, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখ।” নিশীথ কেমন যেন বোকা হয়ে যায় বন্ধুদের কথা শুনে, হীনমন্যতায় ভোগে।

৩.

কয়েকবছর পর পশ্চিমবঙ্গে আবার একটা নির্বাচন আসছে। চারিদিকে শুধু তৃণমূল আর তৃণমূলের ডঙ্কা বাজছে। নিশীথ বিস্মিত চোখে দেখে। কোথায় গেল পার্টি কমরেডরা? মাইক্রোস্কোপ চাই নাকি? তিন দশকের নির্বাচনের দিনগুলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার, মিছিল, গরিব মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা। অচলায়তন ভেঙে ওরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছিল। ওদের পঞ্চায়েত গ্রামে-গ্রামে রাস্তাঘাট-জল- বিদ্যুৎ-শিক্ষার সব ব্যবস্থা করেছিল। নিশীথ আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে পার্টি কি তাহলে হারিয়ে গেল? লালঝাণ্ডা কি অস্পৃশ্য?

এভাবেই ভোটের দিনটা এসে গেল। নিশীথ মর্নিংওয়ার্ক করতে গিয়ে দেখেছে তৃণমূলের বেশ কয়েকটি ছাউনি হয়েছে। সর্বত্র সবুজ-হলুদ রঙের পোষাকপরা কর্মীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাড়ি আর মোটরবাইক নিয়ে গ্রামের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত টহল দিচ্ছে। নিশীথ চা-জলযোগ সেরে নিজের ভোটটা বেলা বাড়ার আগেই দিতে গেল। মোবাইলে, নান্তু, মানিক, দীপক, তপনকেও জানাল একসাথে গিয়ে ভোট দিয়ে আজ সারাদিন আড্ডা চলবে। বিরাট লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ও ভাবছিল---এত মানুষ লাইনে দাঁড়িয়েছে এরা কারা? আবার কি পার্টি নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করবে, পুরানো দিনগুলো ফিরে পাবে? নাকি এই অসহ্য অবস্থাটাই স্থায়ী হয়ে যাবে? ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে সব প্রবীণ বন্ধু মিলে ক্লাবের বাইরে সেই অশত্থতলার আড্ডায় বসে রাস্তার মানুষজনের আনাগোনা দেখছিল। গ্রামে যেন উৎসব হচ্ছে। কেউ হেঁটে, কেউ রিক্সায়, কেউ ভ্যানে চেপে ভোট দিতে যাচ্ছে। প্রতিটি লাইটপোস্ট আর রাস্তায় শাসক দলের পতাকা উড়ছে। যুবকদের মুখে-চোখে যেন যুদ্ধজয়ের হাসি। নিশীথকে গাছতলায় দেখে ওদের পাড়ার বাবলু জিজ্ঞাসা করল—“কী নিশীথকাকু অল ওকে তো?”

হঠাৎ চারিদিকে কেমন অস্থিরতা একটা সন্ত্রস্তভাব দেখা দিল। এধার ওধার ছোটাছুটি, ভয়ে কিছু মেয়ে-পুরুষ কোলে বাচ্চা নিয়ে বুথ থেকে গ্রামের দিকে ছুটছে। একটা বোম্ ফাটার শব্দও কানে এল। নিশীথের মধ্যে চঞ্চলতা। ভাবছে কোথাও কিছু ঝামেলা বেধেছে। এমন সময় ওর পরিচিত একজন যুবক লালঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে গ্রামের দিকে ছুটছে দেখে নিশীথ জিজ্ঞাসা করল—“কী ব্যাপার রে? গণ্ডগোল হচ্ছে নাকি?” ছেলেটি নিশীথকে বলল—ওরা বাইরে থেকে গুণ্ডা-মস্তান এনেছে। বুথের সামনে ঝামেলা করছে। মনে হয় বুথ দখল করবে।” ছেলেটা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলে গেল।

নিশীথ অস্থির, ও থাকতে না পেরে নান্তু আর তপনকে নিয়ে পার্টি অফিসে গেল। দেখল পার্টি অফিসে তালা, সব দরজা-জানালা বন্ধ। সময় নষ্ট না করে সে বড় রাস্তায় না গিয়ে গোলাপদিঘির পাড় দিয়ে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে বাউরিপাড়ায় ঢুকে হাঁক পাড়ল—“এখানে সব দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? মোহনকে ডাক। লাঠি-ডাণ্ডা যা আছে বের কর। বের কর লালঝাণ্ডা। চল সব শুয়োরের বাচ্চাদের একবার দেখি”।

ওর কথায় কাজ হল। যারা ওখানে ভয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কি করবে খুঁজে পাচ্ছিল না, দাঁড়িয়ে জটলা করছিল—তারা মেয়ে-পুরুষ সবাই হাতে যে যা পেল—লাঠি-বল্লম-ঝাঁড়া- হাতা-খুন্তি- তীরধনুক নিয়ে নিশীথের সঙ্গে বুথের দিকে এগিয়ে গেল। নিশীথ হাতের কাছে একটা বাঁশের বাখারি দেখে ওটা তুলে নিয়ে এগোতে লাগল। পিছনে অসংখ্য মেয়ে-পুরুষের দল লাঠি-ঝাঁটা মাথার ওপর উঠিয়ে দৌড়াচ্ছে। ওদের মুখে চিৎকার শোনা গেল—“মার মার শালাদের”। মোটরবাইক নিয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। বুথের ধারে কাউকে দেখা গেল না। নিশীথ বলল—“ভাস্যিস তোরা ছিলি। পার্টির নেতারা সবাই এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা সবাই জড়ো হলেন। নিশীথ বলল—“খুঁজে দেখ ঝোপঝাড়ের ভেতরে কেউ লুকিয়ে কিনা?” মোহন বলল—“সবকটা পালিয়েছে”।

নিশীথ হঠাৎ ভিড়ের মাঝে মানিককে দেখে বলল—“তুই কেন এই ঝামেলায় এলি বোকা। শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাবে। বাড়ি যা”। মানিকের কাঁধে একটা লাল ঝাণ্ডা, বলল—এখানে যে অনেক শান্তি রে! নিশীথ দেখল অসংখ্য মানুষ এসে জড়ো হয়েছে। তাদের হাতের লাল পতাকাগুলো শান্তির পারাবত হয়ে পত্‌পত্ করে উড়ছে।

একগুচ্ছ কবিতা

মলয় রায়

১.
রুদ্ধশ্বাসে উন্মুক্ত করি দ্বার
পালাও। আর ভয় করি না অন্ধকার
কপালে হাত।
জ্বর মাপছেন রবীন্দ্রনাথ।

২.
নাভিশ্বাস ছুটছে।
দেয়ালে কালিতে কলমে রংএ
স্বচ্ছতার স্বপ্নে বুক তোলপাড়।
দাঁত ভাঙা গেরস্থ।
বিবর্ণ মনের মাঝে হঠাৎ এক উল্কাপাত।

বপনের ইতিহাস খুঁজে পায়।
বেজে ওঠে রবীন্দ্রনাথ।

৩.
কাকভোরের স্বপ্ন, দুয়ারে চক খড়ির
মুখ আঁকে। পাকস্থলী ছুঁয়ে যায়
মুগ্ধ আলাপনে সহযাত্রী পথ-ঘাট।
আবার এসেছে পঁচিশ বৈশাখ।।

মিলনমেলা

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

ক্যানভাসে ওই পলাশ শিমুল
চোখ ভরানো মায়া
বসন্ত রং ছড়ায় প্রাণে
রক্তে আলো ছায়া

পলাশ শিমুল বিশ্বাসেতে
নিশ্বাসেতে ফাগুন
দোলদোলানো, মনভোলানো
জ্বলছে বুকে আগুন

আগুন জ্বলে ফাগুন-মনে
উতলা মন ছোটে
আকাশতলে, ফুলে ফলে
বাঁশির ধ্বনি ওঠে

বাঁশির ধ্বনি, তোমায় চিনি
আলো ছায়ার খেলা
আকাশতলে, আগুন জ্বলে
প্রাণের মিলনমেলা।

ভাগীরথী থেকে উদ্ধার আবার নিখোঁজও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ জুন : একই দিনে ভাগীরথী নদী থেকে নিখোঁজ বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার, আবার ভাগীরথীতে নিখোঁজ হয়ে গেলেন জামাইষষ্ঠীতে আসা এক জামাই। পূর্বস্থলী থানার কমলনগর ঘাটে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ হয়ে যান মিঠুন প্রামানিক (২৭)। ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালিয়েও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। মৃতের বাড়ি দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে। গত বৈশাখ মাসে তার বিয়ে হয় পূর্বস্থলী থানার মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংহারি গ্রামে। তাঁর শ্বশুরমশাই বাবলু শীল জানান, বিয়ের পর প্রথম জামাইষষ্ঠী করতে মিঠুন আমার বাড়িতে আসে। এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ মিঠুন দুই শালক অনিকেত ও অরিন্দমকে নিয়ে অটো করে কমলানগর ঘাটে স্নান করতে যায়। সে সাঁতার জানতো না তা আমরা জানতাম না। জলে নামার পর সে তলিয়ে যায়। ডুবুরি নামিয়েও তার সন্ধান মেলেনি। অন্যদিকে আজ সকালে কালনা থানার ভাগীরথী নদীর মালতিপুর ঘাট থেকে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করার জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর পরিচয় মেলে। তাঁর নাম আল্পনারানী দত্ত (৬৯), বাড়ি কাটোয়া শহরের আঁতুরঘাটে। তাঁর পুত্র মলয়কুমার দত্ত জানান, গত ১৭ জুন বেলা ১১টা নাগাদ ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। কাটোয়া থেকে কালনা প্রায় ৮০ কিমি দীর্ঘ নদীপথে কি করে মৃতদেহ ভেসে এল, সেটা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। তাই এদিন কালনা হাসপাতালে মৃতদেহ ময়নাতদন্ত না করে বর্ধমান রেফার করা হয়।

বধূকে অগ্নিদগ্ধ করার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ জুন : মাত্র বার ঘন্টার ব্যবধান। পূর্বস্থলীর সিংহারির পর স্বামীর বিরুদ্ধে বধূ অগ্নিদগ্ধ করার অভিযোগ উঠল নদিয়ার শান্তিপুর থানার মানিকনগর গ্রামে। গ্রামটি নদিয়া জেলায় হলেও এই গ্রামের অবস্থান নাদনঘাট থানার ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের একেবারে কাছে। নদিয়া জেলার নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত ঘোলাপাড়া-ফকির ডাঙ্গার মেয়ে রুমা মাহাতো (২৮)-এর সঙ্গে বছর দশক আগে বিয়ে হয় মানিকনগরের সঞ্জিত মাহাতোর। রুমার ভাইয়ের অভিযোগ—বিয়ের পর থেকেই অতিরিক্ত পণ আদায় করতে তার দিদির উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলত। আগেরদিন রাত্রে সেই নির্যাতন চরম মাত্রায় পৌঁছায়। জামাইবাবু মারধরের পর দিদির গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসা চলা অবস্থায় রাতেই তার মৃত্যু হয়। এই অভিযোগ মানতে চায়নি কালনা হাসপাতালেই চিকিৎসারত মৃতা রুমার স্বামী সঞ্চিত মাহাতো। তিনি বলেন, আজকে আমাদের ষষ্ঠী করতে যাওয়ার কথা ছিল। তার বাজার করাও হয়ে গিয়েছিল। এই কেনাকাটা নিয়েই রাত্রে রুমার সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়। তারপর ও ঘরে গিয়ে নিজের শরীরে আগুন লাগায়। আমি সেই আগুন নেভাতে গিয়ে নিজে মারাত্মকভাবে পুড়ে গেছি। আমাদের একটি সাত বছরের সন্তান আছে।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দিল এবিটিএ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ জুন : এবিটিএ বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে বর্ধমান শহরের আমোদবিহারী ভবনে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসা পরীক্ষার মেধা তালিকা থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী শীর্ষেন্দু সাহা, ষষ্ঠ অরিত্রিকা পাল ও প্রতীমান দে, সপ্তম অরিন্দম ঘোষ, দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য; উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের তৃতীয় স্থানাধিকারী তিমিরবরণ দাস, চতুর্থ অর্কদীপ গুঁই, ষষ্ঠ দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অষ্টম সায়ন্তন চক্রবর্তী, নবম অভীক ঘোষ ও সুরজিৎ মাতব্বর এবং হাই মাদ্রাসার আসিয়া খাতুনকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই উপস্থিত ছিলেন। এঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যথাক্রমে অংশুমান কর, সুদীপ্ত গুপ্ত, নুরুল হক, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, অধিক্রম সান্যাল। উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী তিমিরবরণ দাস সংবর্ধনাসভায় বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন অরবিন্দ মণ্ডল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উদস দাস।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। রোমে ১৬৩৩ সালের ২২ জুন। ২। বর্ধমান জেলার করুই গ্রামে, ১৮৮৯ সালের ২২ জুন, মৃত্যু ২৫.১০.১৯৭৫। ৩। ১৯২১ সালের ২২ জুন, নলিনী গুপ্ত এবং এম এন রায়। ৪। গৌরকিশোর ঘোষ। ১৯২৩ সালের ২২ জুন। ৫। সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৪০ সালের ২২ জুন। ৬। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, মীরমদন। ৭। ১৯৮০ সালের ২৩ জুন, বিমান দুর্ঘটনায়। ৮। বিজ্ঞানী ডাঃ জোনাস এডওয়ার্ড শালক। ১৯৯৫ সালের ২৩ জুন। ৯। রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৮১৯ সালের ২৪ জুন। ১০। ইন্দিরা গান্ধি। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন। ১১। বিশ্বখ্যাত পপসঙ্গীত শিল্পী যোসেফ জ্যাকশন। ২৫ জুন, মৃত্যু ২০০৯ সালের ২৫ জুন। ১২। আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন, ২০১৪ সাল।

নাম/পদবী পরিবর্তন

- আমি রীতা মালিক স্বামী—রাজু মালিক, মুরাতমহল পোস্ট, থানা ও জেলা পূর্ব বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট ১৩ জুন ২০১৮ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম রীতা মালিক স্বামী রাজু মালিক যা আধার কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। একটি রেজিস্ট্রি দলিল নং ৩৩২৭ তাং ২৬.০৯.২০০৮-এ আমার ও আমার স্বামীর নাম ভুলবশত রীতা ঘোষ স্বামী রাজু ঘোষ লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমি আমার ও আমার স্বামী পক্ষে ঘোষণা করছি যে রীতা মালিক ও রীতা ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। রাজু মালিক ও রাজু ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

- আমি সেখ সাবু ওরফে সাবু শা পিতা প্রয়াত মেহবুব সেখ ওরফে মেহবুব শা মিঠাপুকুর, ভাঙা মসজিদ, বর্ধমান নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ১২ আগস্ট ২০১১ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম সেখ সাবু ও সাবু শা বলেও পরিচিত। সেখ সাবু ও সাবু শা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

দুই তরুণীকে নিয়ে গেল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ জুন : কাটোয়া-ব্যান্ডেল রেললাইনের ট্রেন ও নবদ্বীপ স্টেশন থেকে উদ্ধার হওয়া দুই তরুণীকে তুলে দেওয়া হয় কাটোয়া চাইল্ড লাইনের হাতে। সেখান থেকে তাদের হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কালনা জি.আর.পি সূত্রে জানা যায়, কালনার জনৈক ট্রেন যাত্রী নীলিমা হালদার নামের একটি ১৫ বছরের তরুণীকে ১৭ জুন রাত্রি ৯টা নাগাদ তাদের হাতে তুলে দিয়ে যায়। সে নিজের নাম ছাড়াও বলে তার বাবার নাম নিত্যানন্দ হালদার, বাড়ি সমুদ্রগড়ের হালদার পাড়ায়। ওর বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য সমুদ্রগড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকি নাদনঘাট থানাতেও নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা মেলেনি। মেয়েটির মাথায় গোলমাল আছে বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় মেয়েটিকে পাওয়া যায় নবদ্বীপ স্টেশনে। তার নাম প্রিয়া মালিক (১৬) বাড়ি নদীয়া জেলার মুতুরিয়া থানার পাকশা গ্রামে। দুটি মেয়েকেই কালনা জি আর পি এদিন সকালে কাটোয়া চাইল্ড লাইনের কর্মীদের হাতে তুলে দেয়। তাদের কালনা মহকুমা হাসপাতালে মেডিক্যাল করিয়ে কাটোয়া রওনা হয়ে যায় চাইল্ড লাইনের কর্মীরা।

ক্লাবের অর্থ তছরূপ

—প্রথম পাতার পর

খুন করার লক্ষে ওরা সশস্ত্র হামলা চালায়। আমার স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে আমিও আক্রান্ত হই। আমি চারজনের নামে লিখিত অভিযোগ জানাই নাদনঘাট থানায়। পুলিশ একজন অভিযুক্তকে আটক করলেও আমাদের পক্ষের একজনকেও পুলিশ আটক করেছে। আমি অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি। এই ব্যাপারে কালনা মহকুমা পুলিশ অফিসার শান্তনু চৌধুরী জানান, নাদনঘাট থানা এই ঘটনায় দু জনকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ—‘হুল’

—দ্বিতীয় পাতার পর

পড়েন ‘হুল’-এর মহানায়ক কানু। তাঁকে বিভিন্ন জায়গা ঘুরিয়ে আনা হয় সিউড়িতে। ১৪-১৬ জানুয়ারি ১৮৫৬ স্পেশাল অফিসার ইলিয়টের এজলাসে বিচারের নামে প্রহসনে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। বাংলার লেফটন্টে গভর্নর হ্যালিডের আদেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার জন্য আনা হয় ভগনাডিহি গ্রামে। তাঁদের যে ঠাকুরবাড়িতে বিদ্রোহের সূচনা, সেখানেই তৈরি করা হয় ফাঁসির মঞ্চ। ১৮৫৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বেলা পৌনে দুটোয় তাঁকে তোলা হয় ফাঁসির মঞ্চে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, “আবার আমি আসব, আবার সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলব। সেই আগুনে পুড়ে মরবে অত্যাচারীর দল”। (স্বপন বসু—‘পশ্চিমবঙ্গ’ ১৪০২)। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও প্রশান্তি ছিল অক্ষুণ্ণ। ছিল শত্রুর প্রতি সীমাহীন ঘৃণা। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক বিদেশি সাংবাদিক লিখলেন “...ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তেও তাঁর মধ্যে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না...” (বেঙ্গলে হরকরা ১ মার্চ ১৮৫৬)। ৬ মার্চ ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-এ অন্যতম দলনেতার ফাঁসিকাঠে মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ২৩ ফেব্রুয়ারি ওই এলাকায় কারো বাড়িতে উনুন জ্বলেনি। ফাঁসির পর কানুকে ৪৫ মিনিট ঝুলিয়ে রাখার পর নামিয়ে এনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আত্মীয় পরিজনদের হাতে তাঁর মরদেহ দেওয়া হয়নি।

বহু দমন পীড়ন ও আত্মত্যাগের পর আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে একটি মহাসংগ্রামের। যা কৃষক সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষর লেখা থাকবে। ব্রিটিশ শাসকরা এই মহাসংগ্রামকে চোর, ডাকাত ও গুণ্ডাদের উচ্ছৃঙ্খলা বলেছে। ‘হুল’ শতবর্ষে সারাভারত কৃষকসভা দেশজুড়ে শতবর্ষ উদযাপন করে। তখন থেকেই ‘হুল’ এর প্রকৃত ইতিহাস জনসমক্ষে আসে। স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও এই গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম স্থান পায়নি।

‘হুল’-এর মৃত্যু নেই। মৃত্যু নেই ৩০ জুনের। নতমস্তকে তাই শ্রদ্ধা জানাই ‘হুল’-এর শহিদদের। ‘হুল’ দীর্ঘজীবী হোক...।

তথ্যসূত্র :

১) মুক্তির সংগ্রামে ভারত (পশ্চিমবঙ্গ সরকার ’৮২)
২) ‘পশ্চিমবঙ্গ’ সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা ১৪০২ (বাংলা ....)
৩) ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়
৪) সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস—ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে
৫) সাঁওতাল অভ্যুত্থান—অরুণ চৌধুরী
৬) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত
৭) মরেও যারা মরে না (যাত্রা পালা) আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -9149831839, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা